১২শ অধ্যায়ঃ বর্তমান বিশ্বে মুসলিম হিসেবে পরিচিত কয়েকটি দল ও উপদল

ইসলামের একটি অন্যতম মূলনীতি হল "মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য"। মুসলিম জাতীয়তবাদের উপর ভিত্তি করে দুনিয়ার সকল মুসলিম জাতীয় ঐক্য গঠন করবে এবং এ ঐক্য বজায় রাখবে ও মেনে চলবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশ (ইমারাত বা সালতানাত) গঠিত হলেও উম্মাহ বা জাতি হিসেবে সবাই থাকবে ঐক্যবদ্ধ, একই নেতার অধীনে, একই সমাজ ভুক্ত, এটাই ইসলামের মূল শিক্ষা। আদম আ. থেকে মুহাম্মাদ সা. পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলই মানুষকে ঐক্যের শিক্ষা দিয়েছেন আর এটাই ইকামাতে দ্বীনের বা দ্বীন কায়েমের বাস্তবরূপ। ইরশাদ হচ্ছে..

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103)

আর (শুনো!) তোমরা (দুনিয়ার সকল মুসলিম) ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর আদর্শ আঁকড়ে থাকবে, তোমরা দলেদলে বিভক্ত হয়ে যেও না। তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, আল্লাহ (ইসলামী ভাতৃত্ববোধ তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শে) তোমাদের অন্তরকে পরস্পরে মিলিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর দয়ায় তোমরা এখন ভাই ভাই হয়ে গেছো। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১০৩)

জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা ফরজ এবং ঐক্য ভঙ্গ করা কুফরঃ ইসলামের মূল শিক্ষা সামাজিক ও জাতীয় ঐক্য। দুনিয়ার সকল মুসলিম থাকবে একতাবদ্ধ, একই সমাজ ভুক্ত, একই নেতা ও একই শাসনের আওতাধীন। মুসলিম ঐক্যের একক ফর্মূলার নাম খিলাফাহ। আল্লাহর আদেশ পালন করে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করে ছিলেন রাসূল সা.। পরে এ ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন সম্মানিত খালীফাহগণ।

- প্রথমে খুলাফা রাশিদীন,
- তারপর উমাইয়্যাহ খিলাফাহ,
- তারপর আব্বাসীয় খিলাফাহ,
- সবশেষে উছমানী খিলাফাহ।

কিন্তু ১৯২৪ ঈসায়ী সনে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয় ইসলামী খালীফাহ। তখন..

- রাসূল সাঃর হাতে গড়া তাওহীদী সমাজ ভেঙ্গে গঠন করা হয় কুফরি সমাজ।
- কুরআনের বিধান বাদ দিয়ে চালু করা হয় মানব রচিত ও মনগড়া বিধান।
- এক জাতি ভেঙ্গে তৈরি করা হয় অনেক জাতি।
- মুসলিম জাতীয়তাবাদের জাগায় চালু করা হয় আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ।
- খিলাফাহর জাগা দখন করে নেয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি।
- ইসলামী অর্থনীতির বদলে চালু করা হয় পুঁজিবাদী অর্থনীতি।
- ওহী ভিত্তিক শিক্ষানীতির জাগায় চালু করা হয় বস্তুবাদী শিক্ষানীতি। এভাবে জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করা হয়।

বিভাজনের কু-ফলঃ বিভক্তি, বিভাজন ও দলাদলির ফলে ধ্বংস হয়েছে জাতি, দুর্বল হয়েছে উম্মাহ, সারা বিশ্বে অসহায় হয়ে পড়েছে ইসলাম ও মুসলিমগণ। অথচ এ ব্যাপারে আগ থেকেই আমাদেরকে হুশিয়ার করে দিয়েছে আল-কুরআন। ইরশাদ হচ্ছে..

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) (انفال)

(হে মুসলিমগণ!) তোমরা আনুগত্য মেনে চলবে আল্লাহর ও তদীয় রাসূলের (জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার এটাই একমাত্র উপায়। তোমরা যে কোনো মূল্যে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখবে) পরস্পরে বিবাদ করবে না, এতে তোমরা ভীত হয়ে যাবে, তোমাদের বাতাস বেরিয়ে (শক্তি নিঃশেষ হয়ে) যাবে। আর (শোনো! তোমরা আল্লাহর পথে) অটল ও অবিচল থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন যারা (তার পথে) অটল ও অবিচল থাকে। (৮ আনফালঃ ৪৬)

প্রাসঙ্গিক বিষয়ঃ আনুগত্য ও অনুকরণ পরিচিতি

আনুগত্যঃ শারীয়া'হ আইনের মূল বিষয় আনুগত্য। কারো বৈধ আদেশ বা নিষেধ মেনে চলার নাম আনুগত্য। আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর, রাসূলের এবং কর্তা ব্যক্তিদের। তারমধ্যে..

- আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন, যে আনুগত্যের মূলভিত্তি দাসত্ব। সুতরাং আল্লাহর সকল আদেশ-ই বৈধ এবং সকল আদেশ-ই মেনে চলতে হবে।
- রাসূলের আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে। (দেখুন নিসাঃ ৬৪) তাই আল্লাহর কুরআনের বিপরীতে হলে রাসূলের হাদীছ মানা হয় না।
- আর কর্তাব্যক্তিদের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া মূলনীতির আওতাধীন থেকে। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য কারো আনুগত্য বৈধ নয়। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৫৯)

অনুকরণঃ কোনো ব্যক্তি, সমাজ, কিতাব বা নীতিকে হুবহু মেনে চলার নাম অনুকরণ। সাধারণত মানুষ তার বাস্তব জীবনে চারটি বিষয়ের অনুকরণ করে থাকে। আর এ চারটি বিষয় হল..

- আদর্শের অনুকরণ
- ব্যক্তির অনুকরণ
- কিতাব বা বিধানের অনুকরণ
- সমাজের অনুকরণ।

আমরা আল্লাহর দাস। তাই আমরা অনুকরণীয় হিসেবে শুধু এটা-ই মেনে নেব যা মানতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর বিধান মেনে আমরা মুসলিমরাও উল্লেখিত চারটি বিষয়ের অনুকরণ করব। যেমন..

- অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে আমরা মেনে চলব ইবরাহীম আঃর আদর্শ তথা তাওহীদ ও শিরক মুক্ত থাকার আদর্শ। এ আদর্শের বিপরীতে অন্যকিছু মেনে নিলে শিরক হয়। (দেখুন সূরাহ হাজ্জ ২২/৭৮)
- ব্যক্তি হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ সাঃ। মুহাম্মাদ সাঃর বিপরীতে অন্য কাউকে অনুকরণীয় হিসেবে মেনে নেওয়া কুফর। (দেখুন সূরাহ আ-ল ই'মরানঃ ৩/৩১)
- কিতাব বা বিধান হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় বিধান হচ্ছে ওহীর মাধ্যমে আগত বিধান। এর বিপরীতে অন্য কিছু মেনে নিলে কুফর ও শিরক হবে। (দেখুন সূরাহ আনয়া'মঃ ৬/১০৬)
- সমাজ হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় সমাজ হচ্ছে সাহাবাদের সমাজ। এ সমাজের বিপরীতে অন্য সমাজের অনুকরণ করলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে। (দেখুন সূরাহ বাক্বারাহ ২/১৩৭)

ঐক্য বিনষ্টের মূল-কারনঃ ইসলামের মূল শিক্ষা মুসলিমদের সামাজিক ও জাতীয় ঐক্য। এ ঐক্য গঠন করা, বজায় রাখা ও মেনে চলা আমাদের উপর ফরজ আর ভঙ্গ করা কুফর। কিন্তু আজকালকার বাস্তবতা হচ্ছে মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য এখন আর নেই। খিলাফাহ ধ্বংসের পর এ ঐক্য ধোলায় মিশে গেছে। মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য ধ্বংসের মূল কারণ দুইটি। যথা..

১. আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদঃ দেশ ভিত্তিক জাতি গঠনের বিভাজনের ফর্মুলা ইসলামী দুনিয়ায় আমদানী করে মুসলিম জাতিকে চিরতরে বিভক্ত করে ফেলেছেন আমাদের রাজনৈতিক নেতাগণ।

২. দলাদলিঃ মসলক ও মিনহাজ ভিত্তিক দলাদলি সৃষ্টি করে উম্মতকে ভেঙ্গে ছিন্ন ভিন্ন করে গিলে খাচ্ছেন আমাদের কিছু অপরিপক্ক, অদক্ষ ও স্বার্থান্বেষী ধর্মীয় নেতাগণ।

আমাদের জাতীয় ঐক্য আজ শুধুই ইতিহাস। এ ঐক্য ধ্বংসের জন্য আমাদের রাজনৈতিক নেতারা যেভাবে দায়ী ঠিক সেভাবেই দায়ী আমাদের অনেক আলিম উলামা। আল্লাহ ও রাসূল বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও ইয়াহুদ নাসারার অনুকরণে আমরাও আজ উম্মতের একতা ভঙ্গ করে নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের সমাজে খ্যাত ও পরিচিত প্রায় সকল দলই আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া নীতি আদর্শের সাথে নিজস্ব কিছু মতাদর্শ যুক্ত করে খাঁটি দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। তাই এ বিষয়ে অবগতির জন্য বর্তমান বিশ্বে আলোচিত ও সমালোচিত কয়েকটি দলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল।

শিয়াঃ বর্তমান সময়ে আলোচিত সমালোচিত দল-উপদল গুলোর অন্যতম একটি হচ্ছে শিয়া। শিয়াদের সূচনার ইতিহাস মোটেই শুভ নয়।

শিয়াদের সূচনার কথাঃ উছমান রা.র খিলাফতকালে আব্দুল্লাহ বিন সাবা নামে এক ইয়াহুদ পণ্ডিত ইসলাম গ্রহণ করে মদীনাতে বসবাস শুরু করে। লোকটি অতি কৌশলে রাসূল পরিবারের দরদ দেখিয়ে খালীফাহ উছমানের বিরোদ্ধে জনগণকে প্ররোচিত করতে শুরু করলে তাকে মদীনাহ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

আব্দুল্লাহ মদীনাহ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ইরাক চলে যায় এবং সেখানে খালীফাহ বিদ্বেষ প্রচার করে বিরাট দল গড়ে তুলে। ফলে ইরাক থেকেও তাকে বহিষ্কার করা হয়। লোকটি মিশর চলে যায় এবং সেখানেও বিরাট দল গঠন করে। পরে হাজ্জ মৌসুমে ইরাকী ও মিশরিদের সমন্বয়ে মদীনাহ আক্রমণ করে উছমান রাঃকে শহীদ করা হয়।

শব্দ পরিচিতিঃ শিয়া' অর্থ দল। তারা বাহ্যত "আহলে বাইত" তথা নবী পরিবারের প্রতি অতিভক্তি প্রকাশ করত এবং রাসূল পরিবারের মূখপাত্র হিসেবে আলী রা.কে সমর্থন দিত বিধায় তখনকার দিনে তারা "শিয়া'তু আলী" (আলীর দল) হিসেবে খ্যাত হয়। কালের আবর্তে এরাই একসময় শিয়া হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠে।

শিয়াদের মাঝে অনেক দল উপদল রয়েছে। তাদের সকল দলের আকীদাহ বিশ্বাস আবার সমান নয়। কারন আব্দুল্লাহ বিন সাবা একেক জায়গায় একেক কথা বলত। যেখানে যা দিয়ে মানুষকে প্ররোচিত করা যায় সে তাই করত। ফলে তাদের নীতি আদর্শ ও আক্বীদাহ বিশ্বাসে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

শিয়ারা সাহাবা বিদ্বেষী। তারা মনে করে রাসূল সা.র পর প্রায় সকল সাহাবীই মুরতাদ হয়ে গিয়ে ছিলেন। শুধু আলী, ফাতিমাহ, হাসান, হুসাইনসহ মাত্র কয়েকজন মুসলিম ছিলেন। তাই এসব সাহাবার বর্নিত হাদীছ তারা মানে না। এছাড়াও কুরআন, মাহদী, খিলাফাহসহ আরো অনেক বিষয়ে তাদের বিভ্রান্তি রয়েছে।

কাদিয়ানীঃ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাস পূর জেলায় একটি গ্রামের নাম কাদিয়ান। এ গ্রামেরই এক ব্যক্তি গোলাম আহমদ। সময়ে সে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠে।
১৭৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধে (চক্রান্তের মাধ্যমে) নবাব সিরাজু-দ-দৌলার বাহিনীকে পরাজিত করে বঙ্গদেশে ইংরেজ সরকার ক্ষমতাবান হয়। তখনকার দিনে বর্তমান বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার, ইত্যাদি অঞ্চল নিয়ে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি নামে আলাদা দেশ ছিল। যে দেশের শাসক ছিল মুসলিম এবং বিচার হত শারীয়াহ আইন মেনে। বঙ্গদেশ দখলের পর ইংরেজ সরকার আস্তে আস্তে পুরা ভারত দখল করে নেয়। তখনকার উলামা সমাজ ভারতকে "দারুল হারব" (যুদ্ধক্ষেত্র) ঘোষণা করেন এবং ইংরেজদের আনুগত্য হারাম ও বিদ্রোহ করা ফরজ বলে ফতোয়া জারি করেন।

ফলে জনগণ ফুসে উঠে। শুরু হয় প্রতিরোধ সংগ্রাম। শাইখ সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও শাহ ইসমাইল শহীদ রাহি.র নেতৃত্বে গড়ে উঠে মুক্তি বাহিনী। উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিরাট একালা দখলে নিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী সরকার। প্রায় ছয় বছর সরকার পরিচালনার পর বালাকোটের ময়দানে এর সমাপ্তি ঘটে।
দক্ষিন ভারতে টিপু সুলতানের নেতৃত্বে গড়ে উঠে আরেক বাহিনী। যে জন্য ইংরেজ সরকারকে অনেক মূল্য দিতে হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ইংরেজরা অন্য ফন্দি আটে। তারা টাকা ও ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে কিছু আলিমকে কিনে নেয়। এদেরই একজন গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং একজন আহমদ রেজা খান বেরলভী। এরা ইংরেজের আনুগত্য মেনে নেয় এবং সরকারের সমর্থনে ফতোয়া জারি করে;

- দেশের শান্তি সৃংখলা বজায় রাখা ফরজ,
- বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হারাম।

এ ফতোয়ার মাধ্যমে তারা ইংরেজদের আনুগত্য মেনে নিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে।

বৃটিশ মিডিয়া এ ফতোয়াকে ফলাও করে প্রচার করে, এদেরকে বিরাট বড় আলিম হিসেবে উপস্থাপন করে এবং এদের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখে। ফলে এদের দম্ভ আরো বেড়ে যায়। এক পর্যায়ে এরা নিজেকে মুজাদ্দিদ বলে দাবী করে। পরে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেকে মাহদী, ঈসা এবং শেষ পর্যন্ত নবী বলে দাবী করে বসে। যে বা যারা তাকে নবী হিসেবে মেনে নেয় বর্তমান বিশ্বে এরা কাদিয়ানী নামে পরিচিত। তবে তারা নিজেদেরকে "আহমদিয়া মুসলিম জামাত" নামে পরিচয় দেয়।

বেরলভীঃ ইংরেজের অন্য দালাল আহমদ রেজা খান বেরলভীর অনুসারীদের বলা হয় বেরলভী। পাকিস্তান ও ভারতে তারা বেরলভী নামে খ্যাত হলেও বাংলাদেশে বেদাতী হিসেবে পরিচিত। তবে তারা নিজেদেরকে "সুন্নী" বা "আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত" নামে পরিচয় দিয়ে থাকে।
বেরলভীরা নবী-রাসূল, পীর-আউলিয়া নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করে এবং মিথ্যা, বানোয়াট কিচ্ছাকাহিনী ও জাল হাদীছ প্রচার করে। তাদের আমল আকীদার অনেক কিছুই ভিত্তিহীন কিচ্ছাকাহিনী, পীর আউলিয়ার স্বপ্ন এবং দ্বাইফ ও মাওদ্বু' বর্ননা নির্ভর। ফলে তাদের আক্বীদাহ ও আমলে বেদয়া'তের ছড়াছড়ি। এমনকি কুরআন হাদীছ বিরোধী কুফর শিরক ও বিদ্যমান।

দেওবন্দীঃ শাইখ সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও শাহ ইসমাইল শহীদ রাহি.র নেতৃত্বে গড়ে উঠা মুক্তি বাহিনীর এক নেতা ছিলেন কাসিম নানতবী।
৬মে ১৮৩১ ঈসায়ী সনে বালাকোটের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলামী সরকারের সমাপ্তি ঘটলে কাসিম নানতবীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে ইংরেজ সরকার। ফলে তিনি আত্মগোপনে চলে যান এবং প্রায় ৩৫ বছর পর ভারতের উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ এলাকায় কতিপয় সঙ্গী নিয়ে একটি মাদরাসাহ প্রতিষ্ঠিত করেন। তারিখটি ছিল ৩০ মে ১৮৬৬ ঈসায়ী। এ মাদরাসাহই বর্তমানে "দারুল উলুম দেওবন্দ" নামে খ্যাত।

দেওবন্দ মাদরাসায় লেখাপড়া করে যারা আলীম হয়েছেন তারা নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে অনেক মাদরাসাহ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং করে যাচ্ছেন। এসব মাদরাসাহই বাংলাদেশে কওমী মাদরাসাহ নামে পরিচিত এবং যারা এসব মাদরাসায় লেখাপড়া করেন তারা "দেওবন্দী" নামে খ্যাত। দেওবন্দী আলাদা কোনো ফিক্বহ বা আক্বীদাহগত দল নয়। ফিক্বহর ক্ষেত্রে দেওবন্দীরা সাধারণত হানাফী মাযহাবের অনুসারী।

বেরলভীদের চেয়ে দেওবন্দীদের মাঝে ইলম চর্চা বেশী। তাই কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন গঠনে বেরলভীদের চেয়ে দেওবন্দীগণ অনেক এগিয়ে। তবে জীবন পরিচালনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে সকল দেওবন্দী আবার সমান নয়। বাস্তবে দেখা যায়..

- দেওবন্দীদের কেউ কেউ বিদয়া'ত ও শিরক মুক্ত জীবন যাপনে সচেষ্ট।
- কিছু দেওবন্দী অনেকটা বেরলভীদের মতই বিদয়া'ত প্রিয়।

- আর কিছু দেওবন্দী খুব সীমিত পরিসরে বিদয়া'তের সাথে জড়িত।

তাবলিগীঃ তাবলীগ জামাত মাওলানা ইলয়াস রাহি.র প্রতিষ্ঠিত দেওবন্দীদেরই একটি উপদল। পথ ভুলা মুসলমানদের দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনতে স্বেচ্ছা সেবক হিসেবে কাজ করে এ জামাত। বাস্তবে দেখা যায় তাবলীগের মাধ্যমে অনেক মানুষ বাহ্যত ধর্মকর্মের দিকে ধাবিত হচ্ছে। মানুষ কলিমা শিখছে, নামায শিখছে এমনকি অনেকের জীবন ধারাই বদলে যাচ্ছে।
তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীনের প্রতি চেতনা বা প্রেরণা পাওয়া গেলেও যথেষ্ট জ্ঞান পাওয়া যায় না। কারন তাবলিগীদের তা'লীম ও ইলম শুধু ফাজায়েলে আমাল নির্ভর। কুরআন হাদীছের সঠিক জ্ঞান চর্চা এখানে প্রায় অনুপস্থিত। ফলে যা হবার তাই হয়।
তাবলীগের মাধ্যমে কিছু মানুষের জীবন ধারা বদলাচ্ছে ঠিকই। তবে প্রয়োজনীয় ইলমের অভাবে সৃষ্টি হচ্ছে নানা বিভ্রান্তি ও গোড়ামী। দিনদিন এতে নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। তাই তাবলিগী ভাইদেরকে কুরআন হাদীছের জ্ঞান আহরণের প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত।

ইখওয়ানীঃ রাসূল সা. মদিনাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলে ছিলেন একটি ইসলামী সরকার ও সমাজ। যার মূলভিত্তি ছিল তাওহীদ এবং আইনের উৎস ছিল ইসলামী শারীয়া'হ। তখন এটাই ছিল প্রতিষ্ঠিত দ্বীন ও প্রতিষ্ঠিত জাতির সামাজিক ও রাজনোইতিক দর্শন। যে দ্বীনকে ঠিকিয়ে রাখার এবং ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল সা.কে প্রায় ৮৭-৯০টির মত যুদ্ধ করতে হয়েছে।
রাসূল সা.র পর এ জাতির হাল ধরে ছিলেন আবু-বাকার, উ'মার, উছমান, আলী, হাসান ও মুয়া'বিয়া রা.হুম। পরে এ ধারাবাহিকতায় উমাইয়্যাহ, আব্বাসিয়্যাহ ও উছমানী খালীফাহগণ মুসলিম জাতির নেতৃত্ব দিয়ে আল্লাহর যমীনে দ্বীনের ঝান্ডা সমুন্নত রেখে ছিলেন।
কিন্তু ১৯২৪ ঈসায়ী সনের ৩রা মার্চ আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয় ইসলামী খিলাফাহ। ১৩শ বছরের জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করে মুসলিম দুনিয়াকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করা হয়। একজাতি ভেঙ্গে সৃষ্টি করা হয় অনেক জাতি। খিলাফাহ ভেঙ্গে তৈরি করা হয় ছোট ছোট রাষ্ট্র ও রাজ্য।

রাসূল সা.র হাতে গড়া সরকার ও সমাজ ব্যবস্থাকে দুনিয়া থেকে বিতাড়িত করা হয়। গুড়িয়ে দেয়া হয় রাসূল সা. ও সাহাবাদের রক্তের উপর প্রতিষ্ঠির দ্বীন ও জাতি। তখন থেকেই..
- মুসলিম জাতীয়তাবাদ ভেঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা হয় আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ।
- খিলাফাহ ব্যবস্থা ধ্বংস করে চালু করা হয় গণতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক রাজনীতি।
- ইসলামী শারীয়া'হ বিতাড়িত করে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ধর্মনিরপেক্ষ সমাজনীতি।

ফলে ইসলাম ও মুসলিমরা হয়ে যায় অভিভাবকহীন, বিসৃংখল। ইসলাম প্রিয় মুসলিমদের চুখে মুখে নেমে আসে অন্ধকার। সবকিছু হারিয়ে তারা যেন দিশাহারা। জাতির এ কঠিন সময়ে জেগে উঠলেন কিছু উদ্যমী মানুষ।

- রাসূল সা.র হাতে গড়া সমাজ ব্যবস্থা আবার প্রতিষ্ঠার জন্য,
- মুসলিম জাতিকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার জন্য,
- আবার ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য

১৯২৮ ঈসায়ী সনের মার্চ মাসে (খিলাফাহ ধ্বংসের ৪বছর পর) মিশরের কতিপয় ইসলামী পণ্ডিত আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের উর্দ্ধে উঠে "ইখওয়ানু-ল-মুসলিমীন" (মুসলিম ব্রাদারহুড) নামে একটি আন্দোলন শুরু করেন। যার নেতৃত্বে ছিলেন সায়্যিদ হাসান আল-বান্না। শুরুতেই "ইখওয়ানু-ল-মুসলিমীন" ইসলামের মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত, দক্ষ, কর্মঠ, একটি মজবুত জনশক্তি গড়ে তুলার প্রতি গুরুত্ব দেয় এবং এ উদ্দেশ্যে বাস্তব সম্মত কিছু কর্মসূচী হাতে নেয়। শুরু হয় পথ চলা।
কিন্তু ইসলামের শত্রুরা "ইখওয়ান"র এ উত্থানকে অশনি সংকেত হিসেবে বিবেচনা করে এবং এ আন্দোলন থেকে জনগণকে দূরে রাখার জন্য একে কিছু মানুষের রাজনৈতিক উচ্চবিলাস হিসেবে প্রচার করা হয়। এ আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য শুরু হয় বাস্তব মুখী নানা পদক্ষেপ। ফাসিক ও মুনাফিক শাসকদের দিয়ে "ইখওয়ান" নেতাকর্মীদের অত্যাচার ও নির্যাতন করা হয়। অনেক নেতাকর্মীকে হত্যাও করা হয়। খিলাফাহ ধ্বংসের পর তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম সাংঘঠিক আন্দোলন "ইখওয়ানু-ল-মুসলিমীন"।
"ইখওয়ানু-ল-মুসলিমীন" প্রথমে মুসলিম সামাজিক আন্দোলন হলেও কালের আবর্তে তারা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

ইখওয়ানের নিজস্ব কোনো ফিক্বহ বা আক্বীদাহ নাই। কুরআন, সাহীহ সুন্নাহ ও মুজতাহিদ ইমামগণের মতামত মেনে চলাই তাদের ঘোষিত মতাদর্শ। তারা ইসলামের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

ইখওয়ান মোটামোটি ভাবে আরব জনগণের সমর্থন পেতে সক্ষম হলেও ভারত উপমহাদেশে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। কারন সাধারণত ভারতের আলীম উলামা স্বভাবগত ভাবেই পীরপন্থি। ফলে তারা ইখওয়ানকে মেনে নিতে পারেননি।

জামায়াতীঃ ভারতের একজন খ্যাতনামা আলিম ছিলেন সৈয়দ আবুল আ'লা মাওদুদী। তিনি "তারজামানু-ল-কুরআন" নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইখওয়ান প্রতিষ্ঠার ১৩ বছর পর ১৯৪১ ঈসায়ী সনের ২৬ আগষ্ট ইখওয়ানের চিন্তা চেতনার সাথে অনেকটা মিল রেখে তিনি "জামায়াতে ইসলামী" নামে একটি সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু করেন। এ সংগঠনের নেতাকর্মীরাই বর্তমানে "জামায়াতী" হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে জামায়াতের সহায়ক ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির; যাকে সংক্ষেপে বলা হয় "শিবির"। তাই জামায়াত ও শিবিরকে একত্র করে অনেকে বলে থাকেন "জামাত শিবির"।
রাজনৈতিক সংগঠন হলেও শুরুতে "জামায়াতে ইসলামী" গণতন্ত্র বিরোধী ছিল। তারা দ্বীন কায়েমে গণবিপ্লবের দাওয়াত দিত। কিন্তু কালের আবর্তে "জামায়াতে ইসলামী" এখন একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল।

এক সময়ে বর্তমান বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িস্যাসহ বিরাট অঞ্চল নিয়ে "বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী" নামে বিরাট দেশ ছিল। এ দেশে ছিল নবাবী শাসন। ১৭৫৭ ঈসায়ী সনে বিরাট চক্রান্তের মাধ্যমে বাংলার নবাব সিরাজু-দ-দৌলার বাহিনীকে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করে ইংরেজরা এ দেশ দখল করে নেয়।
তখন বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে গঠিত হয় বঙ্গ প্রদেশ। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ প্রদেশ ভেঙ্গে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নামে দুটি আলাদা প্রদেশ গঠন করা হয়। ঐতিহাসিকভাবে যা "বঙ্গ ভঙ্গ" নামে পরিচিত।

১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত মোট ১৯০ বছর ইংরেজরা ভারত শাসন করে। এ সময়কে বলা হয় বৃটিশ আমল। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে যায়।
তখন ভারতবর্ষ ভেঙ্গে পাকিস্তান ও ইন্ডিয়া নামে দুইটি আলাদা রাষ্ট্র গঠন করা হয়। বঙ্গ প্রদেশকেও ভাগ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গকে ইন্ডিয়ার এবং পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের অংশ বানানো হয়। তখন থেকে পূর্ব বঙ্গের সরকারী নাম হয় পুর্ব পাকিস্তান।

১৯৭১ সালে ৯ মাস (২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর) যুদ্ধ করে পুর্ববঙ্গ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হয়। একে বলা হয় বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধ। এ যুদ্ধে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেয়ায় বাঙ্গালীরা জামায়াতীদের শত্রু ভাবতে শুরু করে। যার প্রভাব এখনো কাটেনি।

জামায়াতে ইসলামী মুসলিমদের আলাদা কোনো ফিক্বহ বা আক্বীদাহগত দল নয়। বরং শুধুই একটি রাজনৈতিক দল। তাই সরকার ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতিই তারা অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কোনো কোনো ব্যাপারে জামায়াতীদের চিন্তা ভাবনা দেওবন্দী ও বেরলভীদের থেকে একটু ভিন্ন। তাই দেওবন্দী এবং বেরলভীরা জামায়াতকে অপছন্দ করে এবং জামায়াতের বিরোধিতা করে। যদিও সকলেরই উচিত ছিল দলাদলীর উর্দ্ধে উঠে জাতীয় ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব দেয়া এবং ইসলামের মূল শিক্ষা মেনে নিয়ে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা।

সালাফীঃ সালাফীদের সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব সম্পর্কে জানতে হবে। সাথে জানতে হবে বর্তমান সৌদি আরবের গুড়ার কথা।
শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (১৭০৩-১৭৯১) ৮ষ্ট দশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত আলীম। ফিক্বহ হিসেবে তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তখনো তুর্কীদের নেতৃত্বে ইসলামী খিলাফাহ বলবত ছিল। ইতিহাসে যা উছমানী খিলাফাহ নামে পরিচিত।

ইসলামী বিধান মতে খালীফাহ হচ্ছেন দেশ জাতি ও দ্বীনের অভিভাবক। কিন্তু তখনকার খালীফাহগণের উদাসীনতা, অদূরদর্শীতা ও দ্বীনি জ্ঞানে অপরিপক্ষতাসহ নানা দূর্বলতার কারনে মুসলিমদের মাঝে নানা ফিতনাহ ও বিভেদ দানা বেঁধে উঠে। ইসলামী সরকার যা বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়।

পীর পূজা, মাজার পূজাসহ নানা বিদয়া'ত ও শিরকে জড়িয়ে মুসলমানরা তখন দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মাযহাবগত ভিন্নমত তখন দলীয় বিদ্বেষে পরিণত হয়ে ভিন্নপথে রূপান্তরিত হয়। ফলে মক্কার মাসজিদ হারামে ফরজ নামাযের জামায়াতে মুসলিমগণ চার দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রতি ওয়াক্তের নামাযে চার জামায়াতের প্রচলন করা হয়। শুরু হয় চার মাযহারের চার ঈমামের পিছনে আলাদা আলাদা চারটি জামায়াত।

মুসলিমদের এ করুন অবস্থা দেখে শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের মন কেঁদে উঠে। তিনি একজন্য মুর্খতা, বিদয়াত, শিরকসহ আক্বীদাহগত উদাসীনতাকে দায়ী করে আরবের উলামাদের নিয়ে বিশুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেন। যা এক সময় স্বসস্ত্র যুদ্ধে পরিণত হয়।
মাজার পূজারীরা এ আন্দোলনকে ওয়াহাবী আন্দোলন নামে প্রপাগান্ডা শুরু করে এবং শাইখ মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীদের ওয়াহাবী নামে অভিহিত করে।

১৭৪৪ ঈসায়ী (১১৫৭ হিজরি) সনে মুহাম্মদ বিন সাউদ আরবের কিছু অঞ্চল নিয়ে "ইমারাহ দারইয়্যাহ" নামে একটি ইমারাহ (আমীর শাসিত রাষ্ট্র) ঘোষণা করে। ১৮১৮ ঈসায়ী (১২৩৩ হিজরি) সনে যার সমাপ্তি ঘটে।
তারপর মুহাম্মাদ বিন সাউদের ছেলে আব্দুল আজীজ (বিন মুহাম্মাদ) আল-সাউদ ১৮৯১ ঈসায়ী (১৩০৮ হিজরি) সনে আরবের নাজদ (বর্তমান রিয়াদ) অঞ্চল নিয়ে "ইমারাহ নাজদ" নামে একটি ইমারাত গঠন করেন।
১৯০২ ঈসায়ী (১৩১৯ হিজরি) সনে আব্দুল আজিজ আল-সাউদ "ইমারাত নাজদ"কে সম্প্রসারিত করে "সুলতানাত নাজদ" নামে একটি সুলতানাত গঠন করেন। পরে হিজাজ এলাকা নিয়ন্ত্রনে নিয়ে "মামলাকাহ নাজদ ও হিজাজ" (নাজদ ও হিজাজ রাজ্য) নাম করন করা হয়।

১৯৩২ ঈসায়ী (১৩৫১ হিজরি) সনের ২৩ সেপ্টেম্বর আরবের বিরাট অঞ্চল নিয়ে "আল-মামলাকাহ আল-আরাবিয়্যাহ আল-সাউদিয়্যাহ" (সৌদি আরাবিয়া রাজ্য) নামে বর্তমান সৌদি আরব গঠিত হয়।
সাউদ পরিবারের প্রথম শাসক মুহাম্মাদ বিন সাউদ সহীহ আক্বীদার উপর তাওহীদ ভিত্তিক রাজ্য গঠনের অঙ্গিকার করে শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং শাইখের আন্দোলন ও কর্মীদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। সৌদি আরব গঠন ও পরিচালনা থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত যে চুক্তি কার্যকর আছে।
সূত্রঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ও সাউদী আরবের ইতিহাস আমি অনলাইনে একটি কিতাব থেকে সংগ্রহ করেছি। কিতাবটির নাম "তারিখু-ল-হিজাজ"

বিঃ দ্রঃ= আসলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাউদ পরিবারের প্রায় সকল পদক্ষপই ছিল তখনকার খিলাফাহকে পাশ কাটিয়ে বা খিলাফাহ বিরোধী। এমনকি খিলাফাহ সৈন্যদের সাথে তাদের যুদ্ধ হয়েছে বলেও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।
তাই এ পরিবারের সাথে সহযোগিতার কারনে অনেকে বলে থাকেন শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ও খিলাফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ইসলামী বিধান মতে যা বৈধ নয়। তবে তার সমর্থকগণ বলে থাকেন তিনি খালীফার বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে জড়াননি। (আসল ব্যাপার আল্লাহই ভাল জানেন)

ইসলামী আইনকেই সৌদি আরবের সরকারী আইন হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং মাসজিদ হারামে চার জামায়াত বন্ধ করে আবার এক জামায়াতের প্রচলন করা হয়।
শাইখ মুহাম্মাদের অনুসারীগণ সৌদি আরবের ফিক্বহী মিনহাজ হিসেবে নির্দৃষ্ট কোনো মাযহাব অনুসরণ না করে সহীহ আক্বীদাহ ও সহীহ ফিক্বহ মেনে চলার মিনহাজ সমর্থন করেন এবং এজন্য তারা সকল মাযহাব ও ঈমামগণকে সমানভাবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিটি বিষয়ে সহীহ দলীল মেনে নেওয়ার এবং দলীলের মূল্যায়নে বিষয় ভিত্তিক প্রাধান্য দেয়ার মিনহাজ (কর্ম পদ্ধতি) গ্রহণ করেন। যা বর্তমানে সালাফী মিনহাজ নামে খ্যাত।

আসলে সালাফী শুধুই একটি মিনহাজের (কর্ম পদ্ধতির) নাম। সালাফী কোনো ফিক্বহ বা আক্বীদাহগত দল নয়। নীতিগত দিক দিয়ে সালাফীরা হানাফী, মালিকী, শাফিয়ী', হাম্বলীসহ সকল মাযহাবকে স্বীকৃতি দেয় এবং হানাফীদের ঈমাম ত্বাহাবী লিখিত আক্বীদাহ বিষয়ক কিতাব "আক্বীদাহ ত্বাহাবিয়্যাহ"কেও স্বীকৃতি দেয়। এটাই তাদের অফিসিয়াল মিনহাজ।

কিন্তু বর্তমানে (উপমহাদেশের) অনেক সালাফীকে মাযহাব ও ইমাম বিদ্বেষী বক্তব্য দিতে শোনা যায়। এর মূল কারনঃ আগ থেকেই ভারত উপমহাদেশে আহলে হাদীছ নামে একটি কার্যকরি উপদল ছিল। যারা মূলত ফিক্বহ ও মাযহাব বিদ্বেষী। তারা কোনো ফিক্বহ মানত না এবং ফিক্বহী আলিমদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। কিন্তু উপমহাদেশে ফিক্বহ সমর্থক মানুষ বেশী থাকায় তারা অনেকটা কোনঠাসা ছিল। বর্তমানে এই তারাই আরবে গিয়ে নিজেকে সালাফী বলে পরিচয় দিচ্ছেন। তবে মানসিকভাবে ফিক্বহ বিদ্বেষী আহলে হাদিছই রয়ে গেছেন।

ভন্ডপীরঃ ভন্ডপীর বা সুফিবাদ ইসলামের নামে একটি ভন্ডনীতি। তাযকিয়া বা আত্মসুদ্ধির নাম ভাঙ্গিয়ে সুফি ইজম, তরিকত, মারিফত ইত্যাদি নানা নামে এরা ভন্ডামী করে থাকে। ভন্ডরা তাযকিয়া, ওয়াসীলা, শাফায়া'ত ইত্যাদি শব্দের অপব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে। তাই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য উল্লেখিত শব্দসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হল।

তাযকিয়্যাহ পরিচিতিঃ তাযকিয়্যাহ অর্থ বিশুদ্ধ করণ, শুদ্ধি করণ, পরিচ্ছন্ন করণ, ইত্যাদি। আল-কুরআনের অনেক আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাফসীর জালালাইনে এর অর্থ লিখা হয়েছে অন্তরকে "শিরক মুক্ত করা" আর তাফসীর ক্বুরতুবীতে এর অর্থ লিখা হয়েছে.. অন্তর দিয়ে ঈমান আনা /অন্তরকে কুফর, শিরক ও পাপ মুক্ত করা /সম্পদের যাকাত আদায় করা।

তাযকিয়্যাহর প্রকারভেদঃ তাযকিয়্যাহ আসলে ৩ প্রকার হয়ে থাকে। যথা..

ঈমানের তাযকিয়্যাহঃ অর্থাৎ নিজের ঈমান তথা আক্বীদাহ বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ রাখা। আর এর পদ্ধতি হিসেবে উলামা সমাজের সর্বসম্মত নীতিমালা হলঃ দালীল ক্বাত্বয়ী' তথা শুধু আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত এবং মুতাওয়াতির মানের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়সমূহকেই ঈমান ও আক্বীদাহ অংশ হিসেবে বিশ্বাস করা।

আমলের তাযকিয়্যাহঃ অর্থাৎ নিজের কর্ম ও জীবনকে বিশুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ রাখা। আর এর পদ্ধতি হিসেবে উলামা সমাজের সর্বসম্মত নীতিমালা হলঃ বিশুদ্ধ দলীল ছাড়া কোনো বিষয়কে আমলে পরিণত না করা। উল্লেখিত উভয় প্রকার তাযকিয়্যাহ করার জন্যই নবী রাসূলগণকে পাঠানো হয়। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ জুমুয়া'হ এর ২য় আয়াতে।

ক্বলবের তাযকিয়্যাহঃ অর্থাৎ নিজের আত্মা বা অন্তরকে বিশুদ্ধ করা ও বিশুদ্ধ রাখা। মানুষের ক্বলব তথা মানব আত্মা বা মানব অন্তর যেহেতু সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিয়ন্ত্রনাধীন। তাই কোনো মানুষ এটাকে বিশুদ্ধ করতে পারবে না। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ নিসার ৪৯ তম আয়াতে।

তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতিঃ আল-কুরআন অধ্যায়ন করা, আল-কুরআনের অনুশীলনী করা, আল-কুরআনের নীতিমালা মেনে নিজের ঈমান, আমল ও স্বত্তাকে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে মুক্ত করা এবং মুক্ত রাখাই তাযকিয়্যাহর মূলকথা ও সঠিক পদ্ধতি।

একটি ভূলের অবসানঃ আমাদের সমাজের কিছু ভন্ড তাযকিয়্যাহ শব্দ ব্যবহার করে লোকজনকে বুঝায় পীরের কাছে মুরিদ হয়ে তাদের বানানো তরিকা মেনে মারিফত ও তরিকতের নামে মনগড়া যিকির ও অযিফা পাঠ করা এবং পীর থেকে সনদ ও ইজাজত নিয়ে সমাজে পীরের খালীফাহ (প্রতিনিধি) হিসেবে কাজ করা। (বাকারাহঃ ১৫১)

যিকরঃ যিকর অর্থ স্মরণ, স্মরণিকা, আলোচনা, সমালোচনা, বাণী ইত্যাদি। আমাদের বাংলা সমাজে শব্দটিকে একটু বদলিয়ে বলা হয় যিকির বা জিকির। কুরআনের অনেক জায়গায় যিকর বলে আল-কুরআনকে বোঝানো হয়েছে, অনেক জায়গায় নামাযকে যিকর বলা হয়েছে। মোটকথা যিকর শব্দটি পবিত্র কুরআনে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ আল-কুরআন, ইবাদাত, নামায, আলোচনা, সমালোচনা, স্মরণ, জ্ঞান, শারীয়াহ, জীবন বিধান, উপদেশ, ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের সমাজের কিছু মানুষ শব্দটিকে বিচ্যুত করে যিকর বলে বোঝিয়ে থাকেনঃ পীরের বানানো তরিকা অনুযায়ী বিশেষ নিয়মে এবং বিশেষ ভঙ্গিতে কিছু শব্দ জপ করা। তারা শব্দটিকে তার মূলধারা থেকে বিচ্যুত করে ভিন্ন ধারায় নিয়ে যেভাবে আসল অর্থ থেকে অন্য ধারায় প্রবাহিত করছেন এটা অবশ্যই "তাহরীফ" হিসেবে গণ্য হবে।

তরিকতঃ তরিকত উর্দু উচ্চারন। মূল আরবী শব্দ হচ্ছে ত্বারীক্বাহ। ত্বারীক্বাহ আরবী ত্বারীক্ব শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ। ত্বারীক্ব বা ত্বারীক্বাহ অর্থ পথ। মানুষের জীবন পথ বা আদর্শ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন রাসূল সা.র আদর্শকে বলা হয় রাসূলের ত্বারীক্বাহ। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারনে বলা হয় রাসূলের তরিকা। অর্থাৎ রাসূল সা.র আদর্শ বা রাসূল সা.র বাতানো জীবন পথ।

অনেক পীর সাহেব তাদের পীরাকী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজস্ব পদ্ধতি চালু করে থাকেন। তাদের পরিভাষায় এ পদ্ধতিকে বলা হয় তরিকা বা তরিকত। তারা মানুষকে বুঝিয়ে থাকে এ তরিকতই আল্লাহ পাবার সঠিক পথ।

আসল ব্যাপার হলঃ রাসূল সা. আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আদর্শ বা পথ নিয়ে এসেছেন আল্লাহকে খুশী করার এটাই একমাত্র সঠিক পথ। রাসূলের পথ ছাড়া অন্য কারো বানানো পথ কখনো আল্লাহর পথ হতে পারে না।

ওয়াসীলাহঃ সূরাহ মাইদার ৩৫তম আয়াতে ওয়াসীলাহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (35)

ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর এবং আল্লাহর ওয়াসীলাহ (সান্নিধ্য) অনুসন্ধান কর আর আল্লাহর পথে জিহাদ কর, এতে তোমরা সফল হতে পারবে। (৫ মাইদাহঃ ৩৫)

ওয়াসীলাহ পরিচিতিঃ তাফসীর জালালাইন, কুরতুবীসহ তাফসীরের কিতাবাদীতে বলা হয়েছে "ওয়াসীলাহ" অর্থ এমন ইবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করা যায়। কিন্তু ভন্ডরা এ শব্দটি ব্যবহার করে মানুষকে বুঝিয়ে থাকে "ওয়াসীলাহ" অর্থ পীর ধরা বা পীরের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্ট অর্জন করা।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ওয়াসীলাহ অর্থ মাধ্যম, উপায়, উপকরণ, সান্নিধ্য। কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেসব উপায় বা উপকরণ ব্যবহার করা হয় এসবই হল ওয়াসীলাহ। মানব জীবনের মূল লক্ষ্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। তাই যে ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা হয় এটাই ওয়াসীলাহ। হাসান বসরী, মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ, আ'ত্বা, সুদ্দী, বিন যাইদ, আব্দুল্লাহ বিন কাছীর রাহিঃসহ তাফসীর ও হাদীছের প্রসিদ্ধ প্রায় সকল ইমামই এখানে ওয়াসীলাহ শব্দের এমন অর্থ বর্ণনা করেছেন। (দেখুন তাফসীর কুরতুবী) কিন্তু আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর ভন্ডপীর মানুষকে বুঝায় ওয়াসীলাহ অর্থ পীর ধরা।

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতে সফলতার মাধ্যম হিসেবে তিনটি কাজ করতে বলা হয়েছে। যথা..

- আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করা (তথা আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও যাবতীয় কাবীরাহ গোনাহ থেকে বিরত থাকা)
- ওয়াসীলাহ অনুসন্ধান করা (তথা ভেজালমুক্ত ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা)
- আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (তথা দ্বীন কায়েম, দ্বীনের প্রতিরক্ষা ও উম্মতের জন্য যুদ্ধসহ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা)

যে মুসলিম তার বাস্তব জীবনে এ তিনটি কাজের সমন্বয় ঘটাতে পারবে সে সফল হবে, ইন শা-আল্লাহ।

মারিফতঃ মারিফত উর্দু উচ্চারণ। আরবী সঠিক উচ্চারণে শব্দটি হবে "মা'রিফাহ"। মা'রিফাহ বা মারিফত অর্থ পরিচিত হওয়া। মহান আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনকে বলা হয় "মা'রিফাতুল্লাহ"। অর্থাৎ আল্লাহর পরিচিতি। কিন্তু আজকাল একদল ভন্ড শব্দটি ব্যবহার করে লোকজনকে বুঝিয়ে থাকে মারিফত হচ্ছে পীর মুরিদীর উচ্চতর শ্রেণী, যা অর্জন করলে অন্তর চক্ষু খুলে যায়, যা অর্জল করলে মানুষের আত্মা বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে যায়, ইত্যাদি। তারা এ শব্দটিকে রহস্য রহস্য ভাব বা রহস্যময় কোনো কিছু বুঝিয়ে লোকজনকে প্রতারিত করে থাকে।

বিঃ দ্রঃ= ইসলাম অতি ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়। ইসলামের সকল বিষয়কে যথাযত গুরুত্ব দিতে হয়। কোনো বিষয়কে অতি রঞ্জিত করলে বা অবজ্ঞা করলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যায়। যেমনঃ

- ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় আল্লাহ রাসূলের প্রতি ভালোবাসা। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা হতে হয় সবচেয়ে বেশী, অতুলনীয়, অপরিসীম। কিন্তু এ ভালোবাসাকে অপব্যবহার করে, একে স্বার্থ সিদ্ধীর পুঁজি বানিয়ে এবং এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছকে অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে একদল মানুষ।
- ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় হল সৎলোকের সান্নিধ্য। সৎ পথে চলতে হলে সৎলোকের সান্নিধ্য খুবই জরুরী। কিন্তু আজকাল অনেকেই একে স্বার্থ সিদ্ধীর পুঁজি বানিয়ে এবং এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছের অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত হচ্ছেন সুবিধা ভোগী একদল ভন্ড পীর।
- ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ন একটি বিষয় ইলম। হেদায়াতের পথে চলতে হলে ইলম হাসিল করা খুবই জরুরী। কিন্তু আজকাল এসবকে স্বার্থ সিদ্ধীর পুঁজি বানিয়ে এবং এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছকে অতিরঞ্জিত করে অন্য সবকিছু থেকে গাফিল হয়ে একমুখা হয়ে যাচ্ছেন কিছু আলিম।
- ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় প্রচার ও প্রসার। কিন্তু আজকাল এ প্রচার ও প্রসারকে স্বার্থ সিদ্ধীর পুঁজি বানিয়ে এবং এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছ নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করে অন্য সবকিছু পিছনে ফেলে একমুখা হয়ে যাচ্ছেন কিছু তাবলিগী ভাই।
- ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় ইসলামী সমাজ কায়েম করা। ইসলামী সমাজ কায়েমের পন্থা ও ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। কিন্তু আজকাল কিছু মানুষ গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে ইসলাম কায়েমের পন্থা বানিয়েছে। সাথে সাথে একে স্বার্থ সিদ্ধীর পুঁজি বানিয়ে দ্বীন ক্বায়েম সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছকে অতি রঞ্জিত করে নীতিহীন রাজনীতির তালে গা ভাসিয়ে বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত হচ্ছেন অনেক রাজনীতিবিদ।
- ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় জিহাদ বা যুদ্ধ। জিহাদ বা যুদ্ধ ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু আজকাল দুই দল মানুষ এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছের অপব্যবহার করে থাকেন। কেউ কেউ এগুলোকে অবজ্ঞা ও অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। আর কেউ কেউ এসবকে অতি রঞ্জিত করে অতি বাড়াবাড়ি করে চলেছেন।
- ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় নফল ইবাদাত ও যিকির। কিন্তু আজকাল এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছের অপব্যবহার এবং মনগড়া পথ আবিষ্কার করে বিদয়া'তের দিকে ধাবিত হচ্ছে একদল মানুষ।

হেদায়াত পেতে হলে ইসলামের সকল বিষয়কে যথাযত মূল্যায়ন করতে হবে, সঠিকভাবে মেনে নিতে হবে এবং বাস্তব জীবনে সবকিছুর সমন্বয় ঘটাতে হবে। যে বা যারা তাদের বাস্তব জীবনে ইসলামের সকল বিষয়ের সমন্বয় ঘটাতে পারবে তারাই সফল। আর এক দিকে ঝুকে গিয়ে অন্য কিছু ছেড়ে দিলে হিদায়াত পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে।

মুসলিম ভাইবোনদের প্রতি উদাত্ব আহ্বানঃ পরস্পরে বিবাদ ত্যাগ করুন, দলাদলি ও দলবাজি ছেড়ে দিন। মনে রাখবেনঃ কিছু মানুষ তাদের কায়েমি স্বার্থে আমাদেরকে ব্যবহার করছে। মনগড়া মসলক, মিনহাজ ও আক্বীদার দোহাই তুলে পরস্পরে দ্বন্দ লাগিয়ে শয়তানের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে।

আসলে আমরা সবাই মুসলিম, আমরা সবাই একই নবীর উম্মত, একই শারীয়া'হর অনুসারী। ইসলাম দলীল ভিত্তিক ভিন্নমতের সুযোগ দিয়েছে, এটা ইসলামের উদারতা। তাই ভিন্ন ফিক্বহ মেনে চললেও জাতি হিসেবে আমরা এক। আমরা দলীল ভিত্তিক সকল মতামতকে সম্মান দেখাব এবং নীতিগতভাবে মেনেও নেব তবে আমাদেরকে অবশ্যই জাতীয় ও সামাজিক ঐক্য বজায় রাখতে হবে। নতুবা বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে, জাতি হিসেবে আমরা নিঃশেষ হয়ে যাব।

মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আদম আ. থেকে মুহাম্মাদ সা. পর্যন্ত সকল নবীই একতার কথা বলেছেন, ঐক্যের শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু তথাপিও বনী-ইসরাঈল ঐক্যের নীতি ভঙ্গ করে নানা দলে বিভক্ত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই মহান আল্লাহ আমাদের সাবধান করে দিয়েছেনঃ আমরা যেন তাদের মত দলে দলে বিভক্ত না হই, যে কোনো মূল্যে আমরা যেন একতা বজায় রাখি এবং ঐক্যবদ্ধ থাকি। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)

(হে আমার বান্দারা!) তোমরা তাদের মত হইও না! যারা পরস্পরে মতবিরোধ করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে (ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়েছে) অথচ তাদের কাছে বিদ্যমান ছিল সুস্পষ্ট প্রমান (আল্লাহর কিতাব। আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান থাকা সত্বেও অতীতে যারা দলাদলি করেছে এবং তোমাদের যারা দলাদলি করবে) তাদের তরে মহা-আযাব। (আল-ইমরানঃ ১০৫)

আইন ও বিধানঃ উক্ত আয়াতে তাদের সঙ্গ দিতে এবং সমর্থন করতে নিষেধ করা হয়েছে যারা পরস্পরে মতবিরোধ করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ যারা ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে ফেলেছে এবং বানিয়ে ফেলছে তাদের সঙ্গ দেওয়া বা তাদের সমর্থন করাও নিষিদ্ধ। তাই ইসলামী বিধান মতে বিবাদ, বিভক্তি, বিভাজন ও দলাদলি যেমন হারাম ঠিন তেমনিভাবে যারা এসব জঘন্য কাজ করে তাদের সঙ্গ দেওয়া বা তাদের সমর্থন করাও হারাম।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ইসলামে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত অনুমোদিত হলেও বিভক্তি, বিভাজন, দলাদলি ও ভিন্ন পথ বানানো সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত। অতীতে দ্বীন নিয়ে দলাদলি করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ। দলবাজদের সঙ্গ দেয়া বা তাদের সমর্থন করাও নিষিদ্ধ।

উল্লেখ্য দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত আর ভিন্ন পথ এক নয়। দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত ইসলামে অনুমোদিত। তবে এ ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে ফেললে এটা দলাদলি বা দলবাজিতে পরিণত হয়। আর আজকাল অনেক ক্ষেত্রে এমন-ই করা হচ্ছে। (দ্বীন নিয়ে দলাদলি সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সূরাহ মুঅমিনূনঃ ৫৩ এবং এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন আমাদের বই "ভিন্নমত ভিন্ন পথ জাতীয় ঐক্য ও বিজাতীয় অনুকরণ"।)

বিশেষ হুঁশিয়ারিঃ

- × উম্মতের মাঝে বিভেদ ও বিভাজন তৈরি করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। (দেখুনঃ আল-ইমরানঃ ১০৩, ১০৫, আনয়া'মঃ ১৫৩, ১৫৯, তাওবাহঃ ১০৭, ত্বাহাঃ ৯৪, রূমঃ ৩২, শুরাঃ ১৪)
- × বিভক্তি, বিভাজন বা দলাবাজির মূল কারণ ব্যক্তি বা গোষ্টির স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রতিহিংসা। (দেখুন ৪২ শুরাঃ ১৪)
- × যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে রাসূল সাঃর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। (দেখুনঃ ৬ আনয়া'মঃ ১৫৯)
- × আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ ইয়াহুদ ৭১ (অথবা বলেছেন ৭২) দলে বিভক্ত হয়েছিল। খৃষ্টানরাও তাই। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এরা সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই দল কোনটি? বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শে অবিচল থাকবে। (আবু-দাউদঃ ৪৫৯৬, তিরমিযীঃ ২৬৪০, ইবন মাজাঃ ৪৭৯। হাদীছটি সাহীহ)

সূরাহ আনয়া'মের ১৫৯ তম আয়াতের ভাস্য মতে যেহেতু রাসূলের সাথে দলবাজদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাতে বুঝা যায় জান্নাতে শুধু তারাই যাবে যারা দলবাজি করবে না।